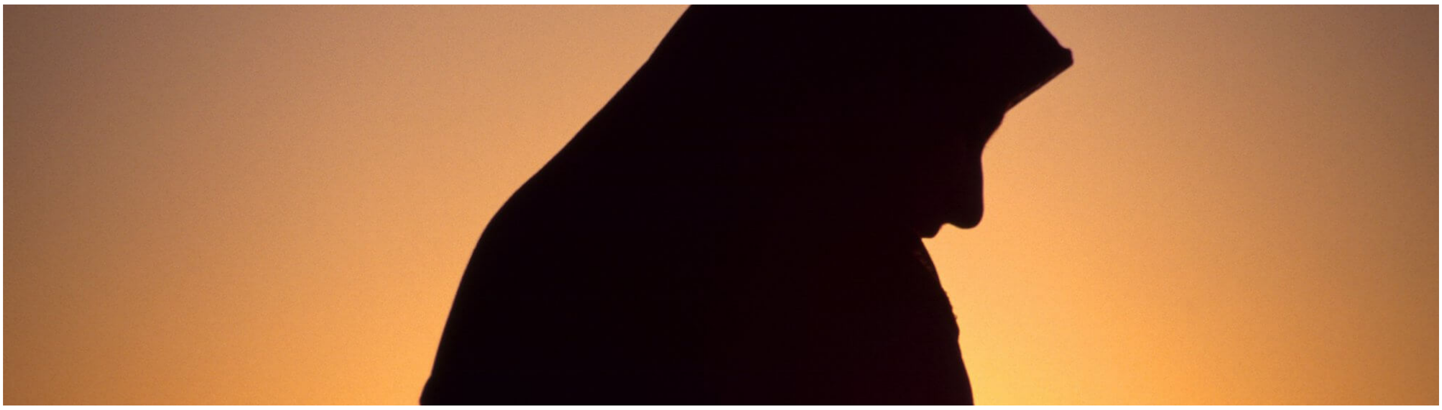

নারী সমাজের উন্নয়ন ও সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ

মুস্তাফা আস্ সিবায়ী

চলতি শতাব্দীর শুরুতেই যখন পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে মুসলিম বিশ্বের যোগসূত্র স্থাপিত হলো, তখন আমাদের সমাজের নারীদের সমস্যা সমাধানে সমাজ সংস্কারকদের মনোযোগ আকৃষ্ট না হয়ে পারলো না। কেননা যুগ যুগ ধরে পুঞ্জীভূত অধঃপতন, অবহেলা ও অধিকারহীনতা আমাদের নারী সমাজকে তখন চরম দুর্দশায় নিপতিত করে রেখেছিল। ফলে আমাদের সমাজের উন্নয়নে ও জাতীয় উত্থানে তাদের আর কোন কার্যকর ভূমিকা পালনের অবকাশ ছিলনা।

সংস্কারের দুইটি পন্থা সংস্কারকামীদের অধিকাংশই দুটি পরস্পর বিরোধী দৃষ্টিভংগী পোষণ করতোঃ

১. যারা ইসলামকে জানতেন, ইসলামে নারী জাতিকে যে উচ্চ মর্যাদার আসন দেয়া হয়েছে, সে বিষয়ে অবহিত ছিলেন, এবং মুসলিম নারী হিসাবে তার যাবতীয় বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করার অপরিহার্যতায় বিশ্বাসী ছিলেন, তারা মুসলিম জনগণকে ইসলামের উত্তরাধিকার দ্বারা উপকৃত হওয়া এবং নারীর উন্নয়ন ও সংস্কারে বিভিন্ন জাতি যেমন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, তা থেকে শিক্ষা গ্রহণের আহবান জানালেন।

২. পাশ্চাত্যে চোখ ধাঁধানো নগর সভ্যতায় যাদের চোখ ঝলসে গিয়েছিল এবং পাশ্চাত্যের চালচলন ও জীবনধারায় যারা অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন, তারা স্বজাতিকে এই বলে আহবান জানাতে লাগলো যে, আমাদের সামাজের নারীদেরকে উন্নতি ও প্রগতি অর্জন করতে হলে পাশ্চাত্যের রীতিনীতি অনুসরণ করতে হবে এবং তাদেরকে ঘরের কোণ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

সংস্কারকরা এই দু�টি দৃষ্টিভংগীর অনুসারী হয়ে দু�টি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই আমি সেই তৃতীয় শিবিরটির উল্লেখ করছিনা, যারা নারীদের বিরাজমান পরিস্থিতিকে পরোপুরি সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছিল এবং তাদের জীবনে আদৌ আর কোন পরিবর্তন ও সংস্কার সাধনের আবশ্যকতা আছে বলে মনে করতোনা। এদের সম্পর্কে আমি আলোচনা করব না। কেননা আমি তাদেরকে বাস্তবতাবাদী মনে করি না। যুগ যুগ ধরে অধঃপতন ও পশ্চাদমুখিতার ফলে নারী সমাজ যে শোচনীয় অবস্থায় পতিত হয়েছিল, তা অব্যাহত থাকার সম্ভাব্য বিপজ্জনক পরিস্থিতি তারা উপলব্ধি করেন বলে আমার মনে হয় না।

নারীর অবস্থার সংস্কারের ব্যাপারে উল্লেখিত দু�টি পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভংগীর প্রতিফল যে আমাদের সমকালীন রাষ্ট্রীয় আইন কানুনে পড়বে, সেটা এক রকম অনিবার্য ছিল বলা যায়।

তাই দেখা যায়, প্রচলিত আইন কানুনে কোথাও নারীদের ব্যাপারে ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্রে বিধিসমূহ হুবহু প্রযুক্ত হয়েছে। আবার কোথাও বা দেখা যায়, ঠিক তার বিপরীত বিধি রচিত হয়েছে। আমি যতটা সংক্ষেপে সম্ভব, এই সকল বিধির পর্যালোচনা করবো।

সংস্কারের ক্ষেত্রসমূহ আমাদের মুসলিম দেশগুলোর আইনকানুনে নারী জাতির উন্নয়ন ও সংস্কারের লক্ষ্যে যেসব পরিবর্তন সাধিত ও বিধিসমূহ রচিত হয়েছে, তাকে আমরা তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করতে পারিঃ

(ক) ব্যক্তিগত অধিকারের ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধিসমূহ (খ) রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধিসমূহ (গ) সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধিসমূহ

নারীর ব্যক্তিগত অধিকার এ কথা সুবিদিত যে, আমাদের পারিবারিক নিয়ম বিধি সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান, মিশর ও ইরাকে শত শত বছর ধরে ইমাম আবু হানিফার মাযহাব থেকে গৃহীত হয়ে এসেছে। আর লিবিয়া, তিউনিস, আলজেরিয়া ও মরক্কোতে মালেকী মাযহাব থেকে, হেজাজ ও অন্য কয়েকটি দেশে শাফেয়ী মাযহাব থেকে এবং সৌদী আরব, কুয়েত ও আরব আমীরাতে হাম্বলী মাযহাব থেকে গৃহীত হয়ে এসেছে।

জনগণ কখনো কোন বিতর্ক লিপ্ত হলে শরীয়তের বিশেয়তের বিশেষজ্ঞ কোন ফকীহ বা মুফতীর কাছে যেত এবং সেই ফকীহ বা মুফতী নিজ অনুসৃত মাযহাব অনুযায়ী ফতোয়া দিয়ে বিতর্কের নিষ্পত্তি করতেন।

এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, প্রত্যেক মাযহাবেরই এমন কিছু বিধি চালু আছে, যা পরিবারের স্বার্থের সহায়ক নয়। বিশেষতঃ সভ্যতা, সামাজিক রীতি প্রথা ও ঐতিহ্যের অগ্রগতির সাথে সাথে সেগুলো অনেকাংশে বেখাপ্পা হয়ে উঠেছে। এজন্য তুরস্কের উসমানী খিলাফাত নিজ শাসনামলের শেষের দিকে পরিবার সংক্রান্ত কিছু ইসলামী বিধিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের সূচনা করে। ১৩৩৬ হিঃ সনে হানাফী মাযহাবের কিছু অভিমত এবং অন্যান্য মাযহাবের কিছু অভিমতের সমন্বয়ে পারিবারিক অধিকার আইন জারী করে। অনুরূপভাবে মিশরও হানাফী মাযহাব বহির্ভূত কিছু সিদ্ধান্ত ও মতামতের ভিত্তিতে নতুন পারিবারিক আইন চালু করার উদ্যোগ নেয়।

১৯৫১ সালে সিরিয়াতে একটি ব্যাপক ভিত্তিক পারিবারিক আইন জারী করা হয়। এতে হানাফী মাযহাব ছাড়া অন্যান্য মাযহাবের মতামত গ্রহন করা হয়। এ আইনের শেষ ধারায় বলা আছে যে, যে ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানে আইনের কোন ধারা পাওয়া যায় না, সেক্ষেত্রে হানাফী মাযহাব অনুসরণ করা হবে।

অনুরূপভাবে জর্ডান, তিউনিস, মরক্কো ও ইরাকে প্রচলিত মাযহাবসমূহের মতামতের সমন্বয়ে নতুন আইন প্রবর্তিত হয়েছে। তবে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধিসহ এই দেশগুলিতে প্রধানত পারিবারিক আইনের কোন কোন বিধি সরাসরি শরীয়তের বিরোধী।

আরব দেশগুলোতে সাম্প্রতিককালে প্রচলিত পারিবারিক আইনসমূহের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, এই সব দেশে একটি নির্দিষ্ট মাযহাবের আনুগত্য ও তদানুসারে আদালত পরিচালিত হওয়ার ফলে জনসাধারণের মনে যে ক্ষোভ স্তূপীভূত ছিল, তা নয়া আইন চালু হওয়ায় অনেকাংশে দূর হয়েছে। বস্তুতঃ একটি নির্দিষ্ট মাযহাবের আনুগত্য সর্বাবস্থায় করে যেতে হবে, এরূপ চিন্তাধারা শরীয়ত দ্বারাও সমর্থিত নয়, আর তা জনস্বার্থেরও অনুকূল নয়।

আমার এ আলোচনাকে আমি সিরীয় ও মিশরীয় পারিবারিক আইন সংস্কারের পর্যালোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবো। কেননা অন্যান্য আরব ও মুসলিম দেশেও সম্ভবতঃ অনুরূপ সংস্কারই সম্পন্ন হয়েছে।

১. বিবাহ বিধির সংস্কার বিবাহ বিধি সংস্কার সংক্রান্ত আলোচনায় সর্বপ্রথমেই আসে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের বিয়ের প্রসংগ।

(ক) বাল্য বিবাহ প্রতিরোধঃ ইসলামের প্রধান প্রধান চারটি মাযহাবের ও অন্যান্য ছোটখাট মাযহাবের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত এই যে, অপ্রাপ্ত বয়স্ক তথা যৌবনে পদার্পণ করেনি এমন বালক বালিকার বিয়ে শরীয়তের দৃষ্টিতে শুদ্ধ। এই মতের স্বপক্ষে তারা আল কোরআনের বহু সংখ্যক উক্তির আলোকে কৃত ইজতিহাদ, রাসূল (সা), সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীদের যুগে সংগঠিত ঘটনাবলীকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত করেন।

তবে ইবনে শাবরুমা প্রমুখ মুষ্টিমেয় সংখ্যক ফকীহ অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক বালিকার বিবাহ সর্বতোভাবে অশুদ্ধ ও অবৈধ বলে রায় দিয়েছেন। তাদের মতে, এই সকল বালক বালিকার অভিভাবকগণ তাদের পক্ষে যে বিয়ে সম্পন্ন করেন, তা সম্পূর্ণ বাতিল এবং তার আদৌ কোন কার্যকারিতা নেই।

এ কথা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, যে কল্যাণ, সার্থকতা, উপকারিতা ও যৌক্তিকতার আলোকে ইসলামী আইনে বিয়ের বিধান প্রবর্তিত হয়েছে, তা এই শেষোক্ত মতেরই সমর্থক। এই বিয়েতে অপ্রাপ্তবয়স্কদের কোনই কল্যাণ, বা উপকারিতা ও সার্থকতা নেই। বরঞ্চ ক্ষেত্র বিশেষে এতে ষোল আনাই ক্ষতি ও অপকারিতা নিহিত রয়েছে কেননা যৌবনে পদার্পণের পর প্রত্যেক যুবক ও যুবতী এমন এক ব্যক্তিকে নিজের স্বামী বা স্ত্রীর আসনে আসীন দেখতে পায় এবং তাকে স্বামী বা স্ত্রী রূপে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়, যে তার জীবনে তার সম্পূর্ণ বিনা ইচ্ছাতে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। তাকে স্বামী বা স্ত্রীরূপে সে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেনি এবং তাকে তার স্বামী বা স্ত্রী বানানোর সময় কেউ তার মতামতও গ্রহণ করেনি। তার সাথে তার স্বভাবে, চরিত্রে ও মনমেজাজে মিল নাও থাকতে পারে। দু জনের একজন চরিত্রহীনও হতে পারে। এমন আরো অনেক অবাঞ্ছিত ব্যাপার ঘটতে পারে এবং অহরহই ঘটে থাকে।

এধরণের বিয়ে শাদীতে, বিশেষভাবে গ্রামাঞ্চলের মানুষ যে কারণে উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকে তা হলো পারিবারিক, অর্থনৈতিক বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বার্থে দুটি পরিবারকে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য অভিভাবকদের আগ্রহ। অনেক ক্ষেত্রে এই দুই পরিবারের অভিভাবকদ্বয় সম্পর্কে পরস্পরের ভাই বা অন্য কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ও হয়ে থাকে। অথচ শরীয়তের দৃষ্টিতে এ ধরনের স্বার্থের কোন গুরুত্ব নেই, আজকের সমাজ জীবনে দাম্পত্য সুখের জন্যও এ ধরনের দৃষ্টিভংগীর কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। এ ক্ষেত্রে বরঞ্চ অত্যাধিক সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, যাতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভবিষ্যতে অবনিবনা হয়ে সম্পর্কচ্ছেদ না ঘটে যায়।

আমাদের সমাজে প্রাচীনকাল থেকে এই ঐতিহ্য চলে আসছে যে, যুবতী কন্যার স্বামী নির্বাচনের কোন অধিকার নেই, বরং পিতা মাতা বা উভয়ে মিলে যার সাথে ভালো মনে করে, কন্যার বিয়ে দেয়। এই ঐতিহ্য চালু থাকায় পিতামাতার পক্ষে কন্যাকে বাল্যকালে বিয়ে দেয়া আরো সহজ কাজ বিবেচিত হয়ে থাকে। ফলে বড় হয়ে সে নিজেকে পিতামাতার মনোনীত স্বামীর স্ত্রী হিসাবে দেখতে পায় এবং বিনা প্রতিবাদে তা মেনে নেয়। এরূপ ক্ষেত্রে বাদ-প্রতিবাদ করতে গেলে স্ত্রী অপমান ও লাঞ্ছনার শিকার হয়। এমনকি সে যদি প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ অব্যাহত রাখে, তা হলে তার খুন হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

এই বিষয়টি শরিয়ত অনুমোদন করেনা। পারিবারিক ও সামাজিক স্বার্থের দোহাই দিয়েও এরূপ কাজ করার যুক্তি নেই। এতে বরঞ্চ যুবক ও যুবতীর দাম্পত্য সাথী বাছাই করার অধিকার অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে ছিনিয়ে নেয়া হয়। অভিজ্ঞতা থেকেও দেখা গেছে যে, এ ধরনের বিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সফল তো হয়ই না, এমনকি বহু ক্ষেত্রে ভয়ংকর নৈতিক পদস্খলন ও হিংসাত্মক অপরাধের মধ্য দিয়ে এর অবসান ঘটে।

এই প্রেক্ষাপটেই সিরীয় পারিবারিক আইন রহিত হয়েছে এবং বাল্যবিবাহ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ ধরণের বিয়ে যদি সংঘটিত হয়েও যায়, তবে আইনের চোখে তা অবৈধ ও অচল। এ আইন উসমানী খিলাফতের আইনের অনুসরণেই রচিত হয়েছে। অবশ্য মিশরীয় আইনে এখনো এটা পুরোপুরি নিষিদ্ধ হয়নি। কেননা গ্রামাঞ্চলে যেখানে বাল্যবিবাহের প্রচলন এত বেশী যে, রাতারাতি এই প্রথা উচ্ছেদ করা সম্ভব নয়। তবে একটি পদক্ষেপের মাধ্যমে এটি উচ্ছেদের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সেটি হলো কোন মিশরীয় আদালতে বাল্যবিবাহ রেজিস্ট্রী হতে পারবে না। কোন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক বা বালিকার সম্পর্ক আদালতের আওতাবহির্ভূত থাকবে। এতে করে বিয়ে অবৈধ ঘোষিত না হলেও বাল্যবিবাহ উচ্ছেদের এটি একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ। তবে আমি মনে করি, সিরীয়াতে যে আইন চালু আছে, তা সবচেয়ে উত্তম।

খ) বিয়ের বয়স নির্ধারণঃ ইসলামী ফেকাহ শাস্ত্রে তথা ইসলামী আইনে বিয়ের কোন নির্দিষ্ট বয়স নেই, অন্য কথায় বিয়ের বয়সের কোন সীমা নির্ধারিত নেই। বরং এর সাধারণ নির্দেশাবলীর মূলকথা এই যে, যৌবনে পদার্পণ করাই একজন মানুষের সাবালক বা সাবালিকা হওয়া ও সকল কাজের যোগ্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট। আর যৌবনে পদার্পণের নিশ্চয়তা লাভের জন্য মোটামোটি ভাবে ২৫ বছর বয়স নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু যেসব মুসলিম দেশে মুসলিম পারিবারিক আইন চালু আছে, তাতে সাধারণত পুরুষের জন্য আঠারো ও নারীর জন্য সতেরো বছরকে যৌবন প্রাপ্তির বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে। এই আইনে ১৮ বছর বয়স্ক পুরুষ ও ১৭ বছর বয়স্কা নারীকে এই অধিকার দেয়া হয়েছে যে, সে আদালতে গিয়ে বিয়ে করার অনুমতি চেয়ে আবেদন জানাতে পারবে। আদালত যখন নিশ্চিত হবে যে, আবেদনকারী বা আবেদনকারীনী দৈহিকভাবে বিবাহযোগ্য এবং তার পিতা বা দাদা তাতে সম্মত, কেবল তখনই আদালত তাকে বিয়ে করার অনুমতি দেবে।

> বিয়ের বয়সের এই কড়াকড়ির পক্ষে কোন মুসলিম ফিকাহ শাস্ত্রকারের সমর্থন নেই। এটা পাশ্চাত্য আইন থেকে গৃহিত। পাশ্চাত্যবাসীর একটা স্বতন্ত্র পরিবেশ ও প্রেক্ষাপট আছে। আমাদের সমাজের প্রত্যেক নরনারী যে ঠিক এই এই বয়সেই যৌবন প্রাপ্ত হয়, তা আমার মনে হয় না। আমাদের সমাজের সাধারণ নৈতিক পরিবেশও এই বয়সের সীমা নির্ধারণের অনুকূল নয়। যৌবন প্রাপ্তির সাথে সাথেই নরনারীর বিয়ে করার অধিকার ও অনুমতি থাকা অপরিহার্য। এটা যুবক-যুবতীর স্বয়ং এবং তাদের অভিভাবকগণই ভালো বুঝবে যে, যৌবন প্রাপ্তির সাথে সাথেই তাদের দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করা কল্যাণকর, না আরো কিছুকাল অপেক্ষা করা বাঞ্ছনীয়। এই ক্ষেত্রে আইন আদালতের হস্তক্ষেপের কোন অর্থ হয় না। যৌবনে পদার্পণ করার সংগে সংগেই যেখানে বিয়ের অনুমতি দেয়, সেখানে যুবক-যুবতীর শারীরিক সামর্থ্য সম্পর্কে আদালতের সম্মতি ও সার্টিফিকেট না পেয়ে বিয়ে করা যাবে না, এর কোন যুক্তি থাকতে পারে না। আদালত কি যুবক-যুবতী বা তাদের অভিভাবকের চেয়ে তাদের স্বার্থ সম্পর্কে বেশী সচেতন?

এ ক্ষেত্রে আদালতের হস্তক্ষেপের কোন ফায়দা আছে বলেও আমার মনে হয় না। কেননা যে পিতামাতা তাদের অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ের বিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর, তারা এ জন্য হাজারো রকমের ফন্দির আশ্রয় নিয়ে থাকে। ফলে বয়সের এই কড়াকড়ি একেবারেই নিরর্থক হয়ে যায়। সবচেয়ে অব্যর্থ যে ফন্দির আশ্রয় নেয়া হয়, তা এই যে, অভিভাবকরা যে মেয়ের বিয়ে দিতে চায়, সে অপ্রাপ্ত বয়স্কা হলে তার জ্যেষ্ঠা বোন, বা চাচাতো বোন বা অন্য কোন বয়স্কা প্রতিবেশীনীকে আদালতে এনে দেখিয়ে দেয় যে, একে বিয়ে দিতে চাওয়া হচ্ছে। ফলে আদালত নির্দ্ধিধায় সম্মতি দিয়ে দেয়। এমতাবস্থায় এই হস্তক্ষেপের কী স্বার্থকতা থাকে?

মনে রাখতে হবে যে, আমাদের এ যুগ-মানুষের সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির অগ্রগামিতার যুগ। মানুষ মাত্রই নিজের সমস্যাবলী অনুধাবন করে। যুবক-যুবতীরা বিয়ের সমস্যা ও ঝক্কিঝামেলা কেমন, তা ভালো করেই জানে। যুবক-যুবতী স্বয়ং বিয়েকে কল্যাণকর মনে করে সম্মতি না দেয়া পর্যন্ত সাধারণ অভিভাবকরাও তাতে সম্মতি দেয় না। অনুরূপভাবে অল্পবয়সে ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেয়ার ফলাফল কী হয়ে থাকে, তাও অভিভাবকদের অজানা থাকে না। কাজেই তারা যখন তাদের কন্যাদের বয়োপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই বিয়ে দিতে আগ্রহী হয়, তখন বুঝতে হবে, এটাকে তারা কল্যাণকরই মনে করেছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কোন কোন পিতামাতা তো স্বার্থের লোভে তাদের মেয়েকে জোরপূর্বক বয়োপ্রাপ্তির সাথে সাথেই বিয়ে দিয়ে দেয়। এর জবাব এই যে, ইমাম আবু হানিফার মাযহাবে কোন প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েকে জোরপুর্বক বিয়েতে রাজী করার অধিকার পিতামাতা বা অভিভাবকের নেই। মেয়ের স্বতস্ফূর্ত সম্মতি ছাড়া বিয়ে দেয়ার কোন অবকাশ নেই। সুতরাং মেয়েদেরকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দিয়ে আর্থিক সুবিধা লাভ করা থেকে পিতামাতা বা অভিভাবককে বিরত রাখার ব্যবস্থা ইসলামী আইনে রয়েছে। আর ইমাম আবু হানিফার মাযহাব অনুসারেই যখন অধিকাংশ মুসলিম দেশের পারিবারিক আইন রচিত, তখন এ ব্যাপারে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই।

২. বয়োপ্রাপ্তির পর যত শীঘ্র সম্ভব বিয়ে দেয়ার যৌক্তিকতা আমি অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে তরুণ-তরুণিদের বিয়ের পক্ষপাতী। কেননা এতে তাদের চরিত্রের নিরাপত্তা অধিকতর নিশ্চিত হয়, তাদের দায়িত্ব জ্ঞান শাণিত হয় এবং স্বামী-স্ত্রীর, বিশেষত স্ত্রীর স্বাস্থ্যের জন্যও তা উপকারী।

এ কথা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত যে, যে কোন দিক দিয়েই বিচার করা হোক না কেন, নারীর জীবনে সন্তান জন্ম দেয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতে যে দৈহিক কষ্ট হয়, স্ত্রীর স্বাস্থ্যের মারাত্নক ক্ষতি করে এমন কথা কেউ বলেনি। শরীর ও মন, নামক পুস্তকের ৬৮ পৃষ্টায় ডক্টর ভিক্টর বোজো মল্টস এই মতের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেনঃ

এ কথা অকাট্য সত্য যে, নারীর স্বাস্থ্যের গঠনে গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ। আমি এ কথা সমর্থন করি না যে বেশী সন্তান প্রসব করলে মেয়েদের আয়ু কমে যায়। কেননা আমরা সবাই জানি, এমন বহু মহিলা রয়েছে, যারা প্রচুর সংখক সন্তান জন্ম দিয়েছে এবং দীর্ঘজীবী হয়েছেন।

> এমন প্রসংগে যুবক-যুবতীদের বিশেষত ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চতর শিক্ষা সমাপ্ত করে কর্মসংস্থান পর্যন্ত বিয়েকে বিলম্বিত করা আমি অত্যন্ত বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর কাজ বলে মনে করি। এর ফলে নানা রকম সামাজিক অপরাধ জন্ম নেয়ার আশংকা রয়েছে। তবে কর্মসংস্থানের পূর্ব পর্যন্ত বৈবাহিক জীবনকে অপেক্ষাকৃত স্বল্পব্যয়ী ও ঝামেলামুক্ত রাখার জন্য প্রয়োজনে সাময়িকভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। যুবক-যুবতীদের চরিত্র সংরক্ষণ, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সমাজকে অপরাধমুক্ত রাখার বৃহত্তর স্বার্থে এটা গ্রহণ করা যেতে পারে।

জানা গেছে যে, মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রীদের প্রায় ৪০ শতাংশ লেখাপড়ার পাশাপাশি বিবাহিত জীবন যাপন করছে। সেখানকার অধ্যাপকগণও একে উৎসাহিত করে থাকেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্বের অধ্যাপক হার্ডন বলেছেন যে, ছাত্রছাত্রীদের বিয়ে ক্ষতিকর তো নয়ই, উপরন্তু তা ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যত সম্পর্কে অধিকতর সচেতন ও অধিকতর সময়ানুবর্তী হতে সাহায্য করে। (আল-ওয়াহ্দাতুদ দামাশকিয়া পত্রিকা, ৫/১১/১৯৬১)

তবে এ জন্য বিয়েশাদীর ক্ষেত্রে প্রচলিত সামাজিক রীতিপ্রথা ও দৃষ্টিভংগীতে ব্যাপক ও আমূল পরিবর্তন আনা অপরিহার্য, যাতে বিয়ের আর্থিক ব্যয়ভার বিপুল পরিমাণে হ্রাস পায়। আমি মনে করি, এই ব্যাপারে তরুণ সমাজের এবং বিশেষভাবে নারী সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের অবকাশ রয়েছে। সামাজিকভাবে বিয়েকে সহজলভ্য ও ব্যভিচারকে কঠিন করার লক্ষ্য নিয়ে এই সংস্কারমুখী কাজটি সম্পন্ন করতে পারলে তা ইসলামী শরিয়তের দাবী যেমন পূরণ করবে, তেমনি সমাজের প্রভূত কল্যাণ

সাধন করবে।

৩. স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বড় রকমের বয়সের ব্যবধান থাকা উচিত নয়ঃ যে সচেতন ও বুদ্ধিদীপ্ত সমাজ নৈতিক মূল্যবোধ ও উচ্চতর সামাজিক লক্ষ্যসমূহের মর্যাদা দেয়, সে সমাজে আইন রচনার কাজ সমাজের প্রাজ্ঞ সদস্যদের দায়িত্বে অর্পণ করা হয়। তারা বিরাজমান পরিস্থিতি ও পরিবেশের আলোকে কোন জিনিসকে সুনির্দিষ্ট করা, প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে নিষিদ্ধ বা বৈধ করতে পারেন।

এ প্রসংগে উল্লেখ্য এই যে, ইসলামী শরীয়ত বিবাহের মহৎ উদ্দেশ্য এবং তার সুমহান সামাজিক লক্ষ্যসমূহ বর্ণনা করেই ক্ষান্ত থেকেছে। আর সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো, মানুষের মানসিক শান্তি, পরিতৃপ্তি ও নিশ্চিন্ততা নিশ্চিত করা। তার দায়িত্ব পালনে সাহায্য করা এবং এমন একটি সৎ সামষ্টিক অবকাঠামো বিনির্মাণে সহযোগিতা করা, যা মানব সমাজকে একটি শক্তিশালী কর্মক্ষম ও সৎ প্রজন্ম উপহার দিতে পারবে।

কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বয়সের ব্যবধান কেমন হওয়া উচিত, তা নির্ধারণ করা হয়নি। কেননা এ জিনিসটা সুস্থ বিবেক বুদ্ধিসমন্ন প্রজ্ঞাবান লোকেরা আপনা থেকেই বুঝে নিতে পারে। তাছাড়া এ ক্ষেত্রে ক্ষমতা ও যোগ্যতার দিক দিয়ে মানুষের ভিতরে অনেক পার্থক্য রয়েছে। কেননা অধিক বয়স্কদের মধ্যে এমন লোক প্রচুর রয়েছে, যারা দাম্পত্য দায়দায়িত্ব পালনের ক্ষমতায়, স্ত্রীকে সুখী করার যোগ্যতায় এবং গৃহকে আনন্দ উল্লাসে মাতিয়ে রাখার ব্যাপারে বহু অল্পবয়সী তরুণের চেয়ে অধিক দক্ষ, সফল ও কুশলী।

তবে কিছু কিছু অভিভাবক এমন স্বার্থান্ধ হয়ে থাকেন, যারা স্থায়ী ক্ষতির কথা বিবেচনায় না এনে উপস্থিত লাভকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। আর এই স্বার্থান্ধ চিন্তার ভিত্তিতেই তারা আপন কন্যাদেরকে দাম্পত্য দায়িত্ব পালনে অক্ষম অথচ বিত্তশালী বৃদ্ধ লোকদের সাথে বিয়ে দেন। একটি যুবতী মেয়েকে এ ধরনের বিয়ে দেয়া প্রকৃত পক্ষে তাকে কবরে পাঠানোর শামিল।

এ ধরনের লোকেরা তাদের কন্যাদের প্রতি যারপরনাই অবিচার করে থাকে। শরীয়ত স্পষ্ট ভাষায় তাদের এ কাজ নিষিদ্ধ না করলেও যে মহৎ উদ্দেশ্যে সে বিয়ের বিধান প্রবর্তিত করেছে, তা এ কাজ নিষিদ্ধ করে এবং এইসব অভিভাবককে তিরস্কৃত করে।

কোন কোন ফকিহ এ ধরনের বিয়েকে হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। দুঃখের বিষয় যে, সুস্পষ্ট ও সর্বসম্মতিভাবে নিষিদ্ধ না হওয়ায় অনেক অভিভাবক নিজেদের যুবতী কন্যাকে নিছক সম্পত্তির লোভে মরণোন্মুখ বৃদ্ধদের সাথে বিয়ে দিয়ে থাকে। এমন কি ক্ষেত্র বিশেষ যুবতী মেয়েরাও এ ধরণের স্বামী বেছে নেয়। অথচ এ ধরণের বিয়ে কোন যুবতী নারীর সতীত্ব রক্ষায় সাহায্য করে না এবং তার দাম্পত্য সুখও নিশ্চিত করে না। সুতরাং ইসলামী আইনে এই বিয়ে স্পষ্ট ভাষায় ও কড়াকড়িভাবে নিষিদ্ধ করা না হলেও ইসলামী আইনের অন্তর্নিহিত ভাবধারা ও তার উদ্দেশ্য উপলব্ধি করে ইসলামী আইন প্রণেতাগণের তাতে হস্তক্ষেপ ও বাধা দান করা কর্তব্য। কেননা এ ধরণের বিয়ে সমাজে ব্যাপক বিকৃতি ও অপরাধের জন্ম দিতে পারে, এ আশংকা প্রবল। তাই স্বামী-স্ত্রীর বয়সে বড় রকমের ব্যবধান থাকলে এবং এ দ্বারা কোন বৃহত্তর কল্যাণ নিশ্চিত করা না হলে আদালতকে এ ধরনের বিয়েতে বাধা দেয়ার অধিকার প্রদান করার ব্যবস্থা প্রত্যেক ইসলামী দেশের আইনে থাকা উচিত। সেই সাথে এই ব্যবধানের সুনির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ণয় করার ভারও আদালতকে দেয়া উচিত। আমার মতে, সর্বোপরি ২০ বছরের বেশী ব্যবধান অনুমোদনযোগ্য ন্য।

৪. বিয়ের ক্ষেত্রে অভিভাবকের একনায়কত্ব অবাঞ্ছিতঃ আমাদের মুসলিম সমাজে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে যে ঐতিহ্য প্রচলিত আছে, তাতে যুবতী কন্যার স্বামী নির্বাচনে স্বাধীনতা নেই বললেই চলে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাদেরকে মা-বাপের পছন্দ অপছন্দ মুখ বুজে মেনে নিতে হয়। একদিকে কুমারী যুবতী কন্যা যেমন নিজের মতামত ব্যক্ত করতে লজ্জা পায়, অপর দিকে তেমনি বিরাজমান সামাজিক পরিবেশও তাকে পিতামাতা ও অভিভাবকদের ইচ্ছায় আপত্তি জানানোর অধিকার দেয় না। অথচ বহু ক্ষেত্রে এই কারণেই বিয়ে ব্যর্থ হয়ে থাকে এবং এর সাথে অনেক হৃদয়বিদারক ঘটনাও সংযুক্ত হয়।

ইসলামী আইনের কোথাও সুস্পষ্টভাবে এরূপ একনায়কসুলভ ক্ষমতা অভিভাবককে দেয়া হয়েছে বলে কোন প্রমাণ নেই। তবে কোন কোন মাযহাব ইজতিহাদের ভিত্তিতে বলা হয়েছে যে, পিতা তার কুমারী যুবতী কন্যাকে নিজের ইচ্ছামত জোরপূর্বক বিয়ে দিতে পারে, তবে তালাকপ্রাপ্তা কন্যাকে জোরপূর্বক বিয়ে দিতে পারে না। অবশ্য সর্বাবস্থায়ই কুমারী কন্যার মতামত নেয়া মুস্তাহাব বা বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর সহ-মতালম্বীগণ উক্ত মতের বিরোধিতা করেছেন। তারা বলেছেন যে, প্রাপ্ত বয়স্কা কন্যাকে জোর করে বিয়ে দেয়ার কোন অধিকার পিতা বা অন্য কোন অভিভাবকের নেই। বিয়ে দেয়ার সময় কন্যার মতামত নেয়া অপরিহার্য। সে মত দিলে বিয়ে শুদ্ধ হবে, নচেত শুদ্ধ হবে না।

ইমাম আবু হানিফার এই রায় অনুসারেই মুসলিম আদালতগুলো কাজ চালিয়ে আসছে। ফলে যুবতী কন্যার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দেয়ার কোন অনুমতি ছিল না। তবে এই সাথে ইমাম আবু হানিফা অভিভাবকদেরকে এই অধিকার দিয়েছেন যে, তারা দুইটি ক্ষেত্রে যুবতী কন্যার নিজ পছন্দমত পাত্রকে বিয়ে করার আপত্তি তুলতে পারেনঃ

প্রথমতঃ যখন স্বামী ও স্ত্রী সমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার অধিকারী (কুফু) হয় না। তবে এই ক্ষমতার মাপকাঠি নিরূপণে ইমাম আবু হানিফা ও অন্যান্য ইমামদের মতভেদ রয়েছে। এই মাপকাঠি বংশীয় মর্যাদা, পেশা, পিতা ও দাদার মর্যাদা ও বিত্ত-বৈভব ইত্যাদির মধ্যে কেন্দ্রীভূত। এ ক্ষেত্রে অজ্ঞ অভিভাবকদের হস্তক্ষেপের জন্য খুবই প্রশস্ত সুযোগ দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ মোহরের পরিমাণ যদি এরূপ ধার্য করা হয়, যা তার রক্ত সম্পর্কীয় অন্যান্য বিবাহিতা নারীর কারো মোহরের সমান নয়। (মোহরে মিসিল) এরূপ ক্ষেত্রে পিতা ও অভিভাবকদের মর্যাদাহানি ঘটে বিধায় তারা এ ধরনের বিয়ে ভেংগে দিতে পারেন। (অর্থাৎ কিনা ইমাম আবু হানিফার দৃষ্টিতে কন্যা ও অভিভাবক উভয়ে সীমিত ভেটো ক্ষমতার অধিকারী)।

এ কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, সামাজিক জীবনে ব্যাপক বিবর্তন ঘটার প্রেক্ষাপটে এ বিষয়টির প্রতি আমাদের দৃষ্টিভংগীতে মৌলিক পরিবর্তন আনয়ন আবশ্যক হয়ে পড়েছে। সিরীয় পারিবারিক আইনে এ সমস্যাটার যে সমাধান দেয়া হয়েছে, তা বেশ ভারসাম্যপূর্ণ বলে মনে হয়।

এ আইনে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সমতার আবশ্যকতাকে বহাল রাখা হয়েছে এবং নীতিগতভাবে এটা দাম্পত্য সুখ ও সমঝোতার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু সমতা কিসে কিসে ও কিভাবে নির্ণিত হবে, সেটা ছেড়ে দেয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট স্থান, কাল ও সমাজের প্রচলিত স্বীকৃত রীতি প্রথার ওপর। এটা একটা বিজ্ঞজনোচিত ব্যবস্থা, যা প্রত্যেক যুগে পারিবারিক সুখ-শান্তি নিশ্চিত করতে সক্ষম।

এ আইনে পিতাকে এই এই অধিকার দেয়া হয়েছে যে, তিনি তার যে যুবতী কন্যা তার অমতে বিয়ে করেছে, তা বিরুদ্ধে আদালতে অসম বিয়ে করার অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। আদালত তদন্ত করে যদি নিশ্চিত হয় যে, পিতার অভিযোগ সত্য, তাহলে বিয়ে ভেংগে দেবে, নচেত তা বহাল থাকবে।

এ ভাবে এ আইনটি পিতামাতার একনায়কসুলভ হস্তক্ষেপ এবং কন্যার লাগামহীন স্বেচ্ছাচারিতা- দুটোকেই রোধ করছে।

বিয়ের শর্তাবলিঃ বিয়ের চুক্তিতে কোন বিশেষ জিনিসের শর্ত আরোপ করা অনেক সময় স্ত্রীর স্বার্থের অনুকূল হয়ে থাকে। ইসলামী আইনে এ ধরণের শর্ত আরোপের বিরোধী নয়- যদি তা সাধারণ জনস্বার্থ, শরীয়তের মূল উদ্দেশ্য-লক্ষ্য ও সমাজের কল্যাণের পরিপন্থী না হয়। এ ক্ষেত্রে যে বিষয়টি সকল মাযহাবে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত তা এই যে, বিয়ের মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে, এমন যে কোন শর্ত বাতিল বলে গণ্য হবে, যেমন এরূপ শর্ত আরোপ করা যে, স্ত্রী স্বামীর আনুগত্য করতে বাধ্য থাকবে না বা স্বামী স্ত্রীর খোরপোশ দিতে বাধ্য থাকবে না ইত্যাদি। এ ধরনের শর্ত দ্বারা বিয়েই বৈধ হবেনা।

আর যদি এমন শর্ত আরোপ করা হয় যা দাম্পত্য সম্পর্কের সাথে সংগতিশীল নয়, কুরআন হাদীস দ্বারাও তা সমর্থিত নয় এবং দেশের প্রচলিত রীতির খেলাপ, তবে সে ক্ষেত্রে বিয়ে বৈধ ও শর্ত বাতিল হবে, এমনকি যদি দুই পক্ষ তাতে সম্মত হয় তবুও। যেমন স্ত্রীকে নিয়ে তার পৈতৃক শহর বা গ্রামের বাইরে যাওয়া যাবে না, আর কোন বিয়ে করা যাবে না, দেনমোহর দেয়া হবে না, স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর খোরপোশ বহন করতে হবে, স্ত্রীর সাথে সহবাস করা যাবে না, স্ত্রীকে একাকিনী সফর করতে বা অনুরূপ শরীয়ত বিরোধী কাজের সুযোগ দিতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

আর এক রকমের শর্ত রয়েছে, যা বৈধ, তবে তা কার্যকরী করতে স্বামীকে আইনগত বাধ্য করা যায় না, কিন্তু সম্মতি দিয়ে কার্যকরী না করলে স্ত্রী বিয়ে বাতিল করার অধিকারী হবে। যেমন, স্বামী বিদেশে যেতে পারবে না, চাকুরী করতে পারবেনা, রাজনীতি করতে পারবেনা, নতুন বিয়ে করতে পারবেনা বা পূর্বতন স্ত্রীকে তালাক দিতে হবে- ইত্যাদি।

এ থেকে বুঝা গেল যে,বিয়ের মূল উদ্দেশ্য নস্যাত না হয় এমন যে কোন শর্ত আরোপ করার এবং প্রয়োজনে শর্ত লংঘন করলে বিয়ে বাতিল করারও স্বাধীনতা স্ত্রীকে দেয়া হয়েছে।

এছাড়া বিয়ের কাবিনে স্ত্রীকে তালাকের অধিকার দেয়া এবং তার অনুমতি ছাড়া নতুন বিয়ে করলে দুই স্ত্রীর একজন তালাক হয়ে যাবে- এই মর্মে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে শর্ত আরোপ করা হলে এই শর্ত মেনে চলতে স্বামী বাধ্য থাকবে। এ শর্ত কোন

অবস্থাতেই বাতিল হবেনা।

সূত্রঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত “ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী” গ্রন্থ।

মুস্তাফা আস্ সিবায়ী

ডঃ মুস্তাফা আস্ সিবায়ী ১৯১৫ সালে সিরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ধর্মতত্ত্বে লেখাপড়া করেন। কর্মজীবনে তিনি দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ধর্মতত্ত্বে শিক্ষকতা সহ সেখানে ধর্মতত্ত্ব অনুষদের ডীন নিযুক্ত হন। আল-আজহারে অধ্যায়নকালে তিনি মুসলিম ব্রাদারহুদের প্রতিষ্ঠাতা হাসান আল-বান্নার বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হন এবং পরবর্তীতে তিনি ব্রাদারহুডে যোগ দেন। ১৯৪৬ সালে তিনি সিরিয়ায় ব্রাদারহুড-এর শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। এই মহান মুসলিম প্রবাদ পুরুষ ৩ অক্টবর, ১৯৬৪ সালে এই ইহলোকের মায়াজাল ত্যাগ করে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে চলে যান। তাঁর উল্লেখযোগ্য কর্মঃ Al-Din wa al-Dawla fi al-Islam (Religion and State in Islam), 1954; Ishtirakiyyat al-Islam (The Socialism of Islam), 1960; Hakaza Alamatni al-Hayat (This is what life learnt me), 1972; Some glittering aspects of the Islamic civilization, 1983; The life of Prophet Muhammad: highlights and lessons, 2004